শিল্পকলা জিনিসটা খুব ব্যক্তিগত

সুধীর চক্রবর্তী। অতি সম্প্রতি তিনি ‘শিল্পের খোঁজে’ লেখার মধ্যে দিয়ে শিল্পকলা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন আমাদের। কিন্তু তারপরও কিছু বাকি থেকে গিয়েছিল। সেই বাকি অংশটাই এবার তিনি জানাচ্ছেন এই সাক্ষাৎকারে।

বাঙালির শিল্পচর্চার একাল সেকাল সম্পর্কে আপনার মতামত ঠিক কি রকম? আপনি তো একাধিক প্রজন্মকে দেখেছেন ও দেখে চলেছেন?

আধুনিক মানুষের বড়ো হয়ে ওঠার মধ্যে নন্দনতত্ত্বের যে একটা ভূমিকা আছে – এটা আমাদের অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার নিজের জীবনবিকাশে ছবি গান ও সাহিত্য প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। একজন আর একজনকে আলো দেখিয়েছে বলা যায়। জীবনে যে কখনও হাতে করে ছবি আঁকেনি বা স্বকণ্ঠে গান গায়নি তার কাছে শিল্পকলার সম্পূর্ণ রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আমাদের ছোটোবেলায় ছবি আঁকার যে পরিসর ছিল, স্কুলে যেভাবে ড্রয়িং শেখাতো তাতে কোনো ইন্টারেস্ট আসে না ছবির প্রতি। এখন যেমন অনেক ছবি আঁকার স্কুল হয়েছে দেখলে ভালো লাগে যে অন্তত একটা বিকাশের আয়োজন আছে। আমাদের পরাধীন ভারতে এরকম কোনও ব্যাপার ছিল না। স্কুল লেভেলে ছেলেরা ছবি আঁকার জন্য প্রতিযোগিতায় যাচ্ছে গার্জেনদের সাহায্যে এটা তখন কল্পনাতীত। কিন্তু এখনকার সমাজে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয়েছে যে শৈশব-কৈশোর মিলে সবকিছুরই আয়োজনটা যেন অনেক বেশি হয়ে গেছে। এত সহজেই এখন ছবি আঁকা যায়, এত রং সবাই হাতে হাতে জুগিয়ে দেয়, এত স্কুল – এত প্রতিযোগিতা হয়েছে, তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মাস্টারমশাইয়ের কাছে একটা কথাই শুনি - যারা নাকি ছবি আঁকা খুব উৎসাহের সঙ্গে শুরু করে তারা প্রায় সকলেই কিছুকাল পরে ছেড়ে দেয়। আর এই

কথাটা নৃত্যশিক্ষক, গানের মাস্টারমশাই, ছবি আঁকার স্যার সবাই বলে। ক্লাশ এইট নাইন পর্যন্ত সবাই শেখে তারপর সব পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যেন লেখাপড়ার সঙ্গে এগুলোর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া দরকার।

আপনার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে শিল্পচর্চায় এই সমস্যা আসেনি নিশ্চয়ই?

আমার ক্ষেত্রে ভাগ্যক্রমে এটা হয়নি। কারণ আমি তো আর এইভাবে বড়ো হইনি। কাজেই পাশাপাশি সবটাই চর্চা করে গেছি। তবে দ্যাখো, জীবনের সুযোগসুবিধের কতকগুলি প্রশ্ন আছে। যেমন আমি যে হঠাৎই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রক্ষিপ্ত হলাম – এটা একটা বিশেষ ঘটনা। গিয়েছিলাম এম. এ.-এর পড়া তৈরি করতে। কিন্তু সেখানে যে এত ভালো ভালো ছবির অ্যালবাম আছে সেটা তো আর জানতাম না। আমি সেই অ্যালবামগুলো দেখলাম। পরবর্তীকালে মনে হল এই অ্যালবামগুলো আমারই বা নেই কেন? ফলে আমি যখন অধ্যাপক হলাম তখন আমি প্রচুর ছবির অ্যালবাম কিনতে শুরু করলাম। ছোটো ছোটো সাইজের তখন খুব সুন্দর বিদেশি অ্যালবাম পাওয়া যেত এদেশে খুব কম দামে, হয়তো পাঁচ টাকা। আমার কাছে এরকম বইয়ের সিরিজ ছিল। ছিল বলাই ভালো, কারণ সবই চুরি হয়ে গেছে। কেউ কেউ সেগুলো নিয়ে আর ফেরত দেননি। এরকম অন্তত শতখানেক অ্যালবাম আমার ছিল, যার জন্য এখনও খুব কষ্ট হয় মনের মধ্যে। যদিও কষ্ট হলেও অ্যালবামগুলো হারিয়ে যায়নি একেবারে, স্মৃতির মধ্যে সেগুলো ধার্য হয়ে আছে। আমাকে ওরা তৈরি করেছে।

শিল্পীদের সম্পর্কে আপনার মনে উৎসাহের সঞ্চার এল কবে থেকে? কীভাবে?

ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের নেপথ্য জীবন জানার আগ্রহটাও থাকা দরকার। সেটাও আমার ক্ষেত্রে ঘটে গেছে। ফলে আমি খুব উপকৃতও হয়েছি। লোকশিল্প থেকে শুরু করে যেকোনও শিল্প সম্পর্কেই আমার অভিজ্ঞতার কারণ হচ্ছে আমি কৃষ্ণনগর শহরে বড়ো হয়েছি। তার পাশেই আছে একটা নদী, সেই নদীর মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর মাটি পাওয়া যায়। সেই মাটি থেকে মৃৎশিল্পের কলোনি তৈরি হয়েছে এদেশে। যা দু-তিনশো বছর ধরে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প নামে প্রসিদ্ধ। সেই মূর্তিগুলো যখন গড়া হচ্ছে আমি সেখানে বসে সরেজমিনে দেখেছি সেগুলো। কীরকম করে মাটি তৈরি করতে হয়, কীরকম করে চৌবাচ্চার মধ্যে মাটি পচিয়ে তাকে তৈরি করা হয়, কী করে একমেটে

দোমেটে মাটি আলাদা হয়ে যায়, ঠাকুর গড়ার সময় কীভাবে কত সাবধানতার সঙ্গে এগোতে হয়, কেমন করে রং গুলতে হয় মাটির খুড়িতে – এগুলো সব আমি নিজের চোখে দেখেছি। একটু আধটু হাত দেওয়ার সুযোগও হয়েছে। রঙের যে প্রচণ্ডতা বা রঙের যে মহিমা আমি হয়তো এখান থেকেই প্রথম পেয়েছি।

গ্রামের লোকেরা কি তাঁদের প্রতিদিনের জীবনে কিছুটা বেশি শিল্প বা সৌন্দর্য সচেতন শহরের লোকের তুলনায়? এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কি?

লোকশিল্পের একটা মজা আছে। সে বড়ো সহজ ও অন্তরঙ্গ। তবে আমাদের নাগরিক গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে সে অর্থে তো খুব একটা লোকজীবন নেই। তারজন্য আমরা যদি একটু বাঁকুড়া পুরুলিয়ার দিকে যাই, যেখানে টুসু-ভাদু গান হয়, মনসার ভাসান হয়, অনেককিছু ঘটনার সঙ্গে যেখানে রিচ্যুয়ালস্ জড়িয়ে আছে। যেমন ধরা যাক সেইরকমই একটা প্রত্যন্ত জায়গায় এক ধরনের দীপাবলি পুতুল পাওয়া গেল। একটা নারী দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতগুলিতে অসংখ্য প্রদীপ, যেগুলোর মধ্যে দীপাবলির দিনে সত্যি সত্যিই আলো জ্বালানো হয়। রিচ্যুয়ালের সঙ্গে মিলিয়ে এই যে লোকশিল্প, দিল্লিতেও দেখেছি এরকম আছে। সাধারণ মানুষ অনেকরকমভাবে জীবনকে আবাহন করে। যেমন একটা পুজো অথবা ব্রত যাইহোক তার সঙ্গে শিল্পের একটা চর্চা আছে। আর তার জন্যে যে খুব বেশি উপাদান লাগে তা নয়। নিতান্তই চাল বেটে তাই দিয়ে একটা আলপনা দিয়ে দেওয়া হল। আলপনার মধ্যে যে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ বা যে সমস্ত ছোটোখাটো মোটিফ থাকে সেগুলো যে খুব উন্নতশৈলীর পরিশীলিত শিল্পকলা তা হয়তো নয়, কিন্তু সেগুলো হল ভেতর থেকে জেগে ওঠা। হয়তো মা করতেন, তাই দেখে মেয়েরা শিখেছে। এই পরম্পরাগত লোকশিল্পের একটা মস্ত বড়ো ভূমিকা এদেশে আছে। ঠাকুর দেবতার

পুজোর সময় আমরা মূর্তিকে একদম সোজাসুজি কোথাও এনে হঠাৎ করে বসিয়ে দিই না, আলপনা এঁকে তার ওপর আমরা যে তাকে বসাই এর মধ্যে একটা অপূর্ব সৌন্দর্যবোধ আছে। এটা বাঙালির একদম জাতিগত বলে মনে হয়। দক্ষিণ-ভারতে অবশ্য এটা আরো বেশি আছে। তারা শস্য দিয়ে আলপনা দেয়। যেমন মসুর ডাল, মটর ডাল, কলাইয়ের ডাল প্রত্যেকের আলাদা এক একটা রং, তাই দিয়ে ওরা ডিজাইন তৈরি করে, ভারি সুন্দর। আমরা এখনও অতটা পেরে উঠিনি, মানে ট্রাডিশনটা এদেশে এখনও আসেনি।

আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজে শিল্প সম্পর্কে এত অচেতনতা-অজ্ঞানতা কেন? এর মূলটা কোথায় বলে আপনার মনে হয়?

শিল্পকলাচর্চার প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে আমার নিজেরই একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি তখন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পড়াচ্ছি – রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'। বায়োগ্রাফি আর অটোবায়োগ্রাফির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে আমি পোর্ট্রেট আর সেল্ফ-পোর্ট্রেট বোঝাতে গিয়েছিলাম। সেটা বোঝাতে গেলে আমাকে তো ছবির অ্যালবাম দেখাতে হবে। আশ্চর্যের বিষয় হল আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম সেখানকার লাইব্রেরিতে কোনও অ্যালবামই নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উচ্চশিক্ষা আছে কিন্তু উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি নেই। একটা জিনিসকে কত উঁচুভাবে ভাবতে হয়, তার মানকে কত উঁচুতে নিয়ে যাবার কথা চিন্তু করতে হয় – এ বিষয়ে আমাদের দেশে ভাবা হয় না। শুধু ছবি কেন, গানের কথাও মনে হয়। আমাদের দেশে যে এতরকমের বাদ্যযন্ত্র ছিল তার মধ্যে অনেকগুলিই লুপ্ত হয়ে গেছে, সেইসব বাদ্যযন্ত্রের একটা করে নমুনা ও সেই সঙ্গে তার শব্দের একটা করে রেকর্ডিং রেখে মিউজিয়ম খুব ভালোভাবেই করা যেত। কিন্তু সেটা ভাবা হয়নি। আমাদের যে সমস্ত শিল্পীরা ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন বিভিন্ন জায়গায়, গ্রামে-গঞ্জে যতরকমের তুলি ব্যবহার হয়, বহু জায়গায় শিল্পীরা নিজেরাই তুলি বানান, সেই তুলি বানানোর কৌশলগুলো আমরা কেউ আলাদাভাবে লক্ষ্য করলাম না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষার সার্বিক ধ্যান কোথাও নেই, আমরা সবকিছুই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় সবটাই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার নয়। এটা হচ্ছে আমাদের সামূহিক

জাতীয়তাবোধের জিনিস। সেদিক থেকে একটা ভয়ানক দুর্বল জায়গা হল আমাদের ছবির দিকটা।

আর আমাদের নাগরিক সমাজের প্রকাশ্য শিল্পচর্চা?

আমি যখন কোনও শহরে যাই সেই শহরটাকে আমি শনাক্ত করতে চাই তার মূর্তিগুলো দিয়ে। কিন্তু বেশিরভাগ শহরেই তো তেমন কোনও মূর্তি নেই। কতকগুলো পুতুলজাতীয় জিনিস আছে। আমাদের কৃষ্ণনগর শহরের পাশে যে এত বড়ো মূর্তিশিল্প আছে, শহরের মধ্যে কোথাও তার কোনও প্রতিফলন পড়েনি। এশহরে একটা বিবেকানন্দ কিংবা হয়তো একটা গৌরাঙ্গের মূর্তি আছে, এগুলো সবই পুতুলপ্রায়। তার মধ্যে কোথাও কোনও অ্যাবস্ট্রাকশন নেই, কোনও চিন্তাভাবনার দিক নেই। আর যে সমস্ত পোর্ট্রেট বা মানুষের মুখাবয়ব দেখি যত্রতত্র, সেগুলোও এত নিম্নশ্রেণীর কি বলব!

আসলে এগুলোর জন্য তো শিল্পীকে বেশি টাকা দেওয়া হয় না। একটা ভালো শিল্পকলার জন্য যে প্রচুর টাকা লাগে সেটা আমাদের চেতনার মধ্যেই নেই। একটা সমুন্নত শহর, যেখানে দিনরাত অজস্র টাকাপয়সার লেনদেন হচ্ছে, ধরা যাক বহরমপুর অথবা মেদিনীপুর কিংবা শিলিগুড়ি – এসব জায়গায় গেলে আমরা তো শুধুমাত্র শিল্পকলার জন্যই একটা আলাদা জায়গা আশা করি। পাড়ার মোড়গুলোতে কোথায় চমৎকার কতকগুলো শিল্পকলা থাকবে, তা না থেকে কতকগুলো দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্তি থাকে। সেখানকার যিনি বিখ্যাত লোক তাঁর মূর্তি।

বিদেশে এ বিষয়ে আপনার কি অভিজ্ঞতা?

আমি যখন ১৯৯৯ সালে আমেরিকায় গিয়েছিলাম তখন সেখানে নিউইয়র্কে একটা অধ্যাপকদের আবাসন দেখেছিলাম। আবাসনের প্রত্যেকটা বাড়িই প্রায় দশবারোতলা,

তার মাঝখানে একটা বিশাল প্রাঙ্গণ আছে মাঠের মতোই ঘাস দেওয়া। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ে এসে বসে বিকেলবেলায়। প্রত্যেকটি আবাসনের ঘরের পার্কমুখী যে দেওয়ালটা সেটা পুরোটাই কাচের। ফলে যাঁরা ওখানে থাকেন তাঁরা পার্কটা সবসময় দেখতে পান। সেই পার্কের মধ্যে পিকাসোর একটা বিরাট অরিগামি রাখা আছে। আসল অরিগামিটা হয়তো খুবই ছোটো। কিন্তু এই অরিগামিটাকে ওরা প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফিট উঁচু আকারে তৈরি করে রেখেছে। সবাই সেটা দেখছে। এই যে আবাসনের মাঝখানে দারুণ একটা যে শিল্পকলা রাখা হয়েছে – এই সৌন্দর্যবোধটা কিন্তু আমাদের এখানে আশা করা যায় না। আমেরিকার ডালাসে আমি দেখেছিলাম একটা জায়গায় পরপর কতগুলো ঘোড়ার মূর্তি রয়েছে। একসঙ্গে দশটা ধাবমান ঘোড়া ছুটছে। তাদের সেই গতিশীলতা ধরে রাখা হয়েছে। আমাদের দেশে নন্দলাল বসুর মধ্যে আমি এই জিনিসটা দেখতে পাই। তিনি নানারকম পশু, বিশেষ করে অনেকরকমের কুকুরের ছবি এঁকেছেন। শান্তিনিকেতন অঞ্চলে সে-সময় চারিদিকে ঘুরে বেড়াত যেসব কুকুর তাদের কারো ল্যাজটা হয়তো গোটানো, অদ্ভুত সেইসব ছবি। আমাদের বাঙালি শিল্পীদের মধ্যেও দেখেছি পশুদের ছবি আঁকার একটা প্রবণতা আছে। সেগুলো খুব সুন্দর।

‘ধ্রুবপদ’ সম্পাদনাকালেও আমরা আপনার মধ্যে চিত্রপ্রেম লক্ষ্য করেছি। এ বিষয়ে কিছু বলুন। কীভাবে আপনি শিল্পীদের দিয়ে কাজ করিয়েছেন?

আমি যখন ‘ধ্রুবপদ’ সম্পাদনা করি তখন বাউল আর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে দুটি আলাদা সংখ্যা করেছিলাম। কাজটা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল আমাদের দেশে যে এতসব বিখ্যাত শিল্পী আছেন তাঁদের অনেকে বাউলদের ছবি এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি এঁকেছেন, আবার অনেকে আঁকেননি। যাঁরা আগেই এঁকেছিলেন প্রথমে আমি তাঁদের ছবিগুলো সংগ্রহ করি। আর যাঁরা আঁকেননি তাঁদেরকে এই বিষয়ে ছবি আঁকার জন্য অনুরোধ করি। এইসব শিল্পীদের আমি যে চিনতাম বা তাঁরা যে আমায় খুব চিনতেন তা নয়, কিন্তু আমি যে শিল্পীকেই অনুরোধ করেছি তিনি উৎসাহের সঙ্গে আমাকে বলেছেন – ‘হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটা ছবি এঁকে দেব।’ মনে আছে খুব আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে তাঁরা আমাকে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন এবং একটাও পয়সাকড়ি চাননি। ধ্রুবপদের সেই দুটি সংখ্যায় আমি প্রায় এই ধরণের ছবি দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছি। যদিও সব ছবিই যে খুব মানোত্তীর্ণ হয়েছে তা নয়, কিন্তু বাউলজীবনটাকে দেখার কতকগুলো

পারস্পেক্টিভ তার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। এটাকে আমি খুব মূল্যবান বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ সংখ্যা করার সময় ঠিক এইভাবেই মনে হয়েছিল যে – রবীন্দ্রনাথের স্কেচ কে কেমনভাবে আঁকতে চান একটু দেখা যাক। প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথকে আঁকতে চান

এটা কিন্তু লক্ষ্যনীয়। সবাই যে শরৎচন্দ্রকে আঁকতে চান, সুকুমার রায়কে আঁকতে চান তা কিন্তু নয়। আসলে রবীন্দ্রনাথকে আঁকার প্রবণতা বাঙালি শিল্পীর বুকের ভেতরেই আছে। একইভাবে বিবেকানন্দ, গান্ধিজীর মুখাবয়ব আঁকার প্রবণতাও আমি অনেকের মধ্যে দেখেছি। ধ্রুবপদে যে যার মতো করে রবীন্দ্রনাথকে এঁকেছেন। এরফলে হয়েছে কি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেকগুলি বীক্ষণ ফুটে উঠেছে। ফুটে উঠেছে তাঁদের কাছেই যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে কখনও দেখেননি। কী আশ্চর্য! আমার মনে হয় এটাই মানুষের অমরত্বের সবচেয়ে বড়ো নিশানা। যে মানুষটি চলে গেছেন তাঁর একটি করে নিজস্ব মডেল শিল্পীরা তাঁদের মনে রেখে দিয়েছেন। কী অদ্ভুত। সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে হাল আমলের শিল্পী, কে না তাঁর ছবি এঁকেছেন। শিল্প দিয়ে এইভাবে আমরা একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বোধহয় নাগরিক বাঙালির শিল্প-চেতনা ও চর্চার ধারায় কিছুটা ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে আপনার কি ধারণা?

আমি যখন প্রথম শান্তিনিকেতন যাই সেটা ছিল ১৯৬০-৬১ সাল। তখন দুপুরবেলা। আমার মনে আছে যে আমি প্রথমে একেবারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এত বড়ো একটা প্রান্তর, তার মধ্যে এত সব মূর্তি রয়েছে। বেশিরভাগই রামকিঙ্করের করা। সেগুলোর মহত্ত্ব আমাকে সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শ করে। আমি ভাবি একটা শিক্ষাকেন্দ্রের মাঝখানে এই যে মূর্তিগুলো বসানো হয়েছে আর সেটা শিল্পীর ইচ্ছানুসারেই হয়েছে, এরমধ্যে কত সুন্দর একটা শিল্পবোধ কাজ করছে। যেমন বুদ্ধমূর্তিটা যেখানে আছে তার থেকে অন্তত পঞ্চাশ ফিট দূরে একটা সুজাতার মূর্তি আছে। সুজাতা বুদ্ধের জন্যে

পায়েস নিয়ে আসছেন – থিমটা হচ্ছে এই। এখানে একটা ইনস্টলেশনের ভাবও 2আসছে। এই যে ঠিক ঠিক জায়গায় মূর্তিগুলোকে বসানো এটা কিন্তু একটা শিখবার জিনিস। তবে শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্করকে যে ফ্রি-হ্যান্ড কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এটা একটা বিশেষ রকমের মানসিকতা থেকে আসে। সেখানে নন্দলাল বসু ছবি এঁকে চমৎকারভাবে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতেন। সত্যজিৎ রায় যখন ছবি আঁকছেন নন্দলালবাবু তাঁর কাছে গিয়ে বলছেন – 'তুমি গাছ আঁকছো ঠিক আছে, কিন্তু তুমি ওপরটা আগে আঁকছো কেন? তুমি তলা থেকে এসো।' এই শেখাটার কথা সত্যজিৎবাবু নিজে উল্লেখ করেছেন। নন্দলালবাবুই তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন গাছ কেমন করে তলা থেকে আঁকতে হয়।

আসলে মনে হয় প্রকৃতিকে খুব গাঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে শিল্পীর এই চোখটা তৈরি হয়। শহরের মানুষ গ্রামের কাছে গেলে অনেক সময় তার দেখাটা বদলে যায়। আপনার কি মনে হয়?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল – আমার এক বন্ধু সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সে সাঁওতালদের ছবি আঁকা শেখাতে গিয়েছিল। আসলে সে পড়াতেই গিয়েছিল। একদিন সে তার ছাত্রদের বলল 'তোমরা একটা গাছ আঁকোতো।' একটা সাঁওতাল ছেলে গাছের কাণ্ড থেকে আরম্ভ করে তার ডালপালা, ফুল-লতা-পাতা এমনকি পাখিও আঁকলো। সবচেয়ে বিস্ময়কর যেটা সেই ছেলেটি কিন্তু মাটির তলার শেকড়টাও আঁকলো। অবাক হয়ে সন্দীপ ভাবলো আমরাও ড্রয়িং করেছি, আমাদের বাবারাও করেছেন, কিন্তু আমরা তো কখনও গাছের শেকড় আঁকিনি। সে তখন ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো 'আচ্ছা তুমি শেকড় আঁকলে কেন?' ছেলেটি তখন বলল 'শেকড় ছাড়া কি গাছ হয়?' এই উপলব্ধিটা সন্দীপের নাগরিক-চেতনাকে প্রায় চাবকে দিল বলা যায়। সে সঙ্গে সঙ্গে

বুঝলো যে আমাদের লেখাপড়ার সিলেবাসে ও পদ্ধতিতে কতটা কৃত্রিমতা রয়ে গেছে। আমরা গাছ আঁকতে পারি কিন্তু গাছের শেকড়ের কথা কল্পনাই করি না।

আপনি গ্রামে গঞ্জে ঘুরে সঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন অজস্র। কিন্তু আপনি যে শিল্পকলারও সংগ্রাহক এটা বোধহয় অনেকেই জানেন না?

আমি বরাবরই খুব মন দিয়ে রীতিমতো অভিনিবেশ সহকারে বাঁশের কাজ, মাটির কাজ, কাঠের কাজ, আইভরির কাজ ঘুরে ঘুরে দেখেছি নানা জায়গায়। মিউজিয়ামে এসবের নমুনা আছে। বর্মায় কীরকম কাঠের কাজ হত সেগুলো আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। আর এসব দেখতে দেখতেই নানারকম শিল্পবস্তু সংগ্রহ করেছি। আমি যখন যেমন পারতাম সংগ্রহ করতাম। কোথাও কোথাও কিছু পয়সাকড়ি দিয়েও সংগ্রহ করেছি। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। এইগুলো এখন আমার জীবনের একটা অংশ বলে মনে হয়। আমি যখন চলে যাব, তখন আমার সংগৃহীত এই শিল্পকলাগুলো থাকবে। সেগুলোর মধ্যে হয়তো আমার বেঁচে থাকার ইপ্সার একটা ছবি ধরা থাকবে। আমি কীরকম করে বাঁচতে চেয়েছিলাম। শুধু যে জীবনধারণ তা তো নয়, মানুষ যে জীবনটা যাপন করতে চায় তার প্রমাণ হচ্ছে যে তার সংগৃহীত গানগুলো, বইগুলো, শিল্পবস্তুগুলো, তার ঘর সাজানোর কৌশল, বেঁচে থাকার প্রতিটা অভিজ্ঞান তার মধ্যে ধরা থাকে। কিন্তু এই শিক্ষাটা যে আমরা সবসময় অন্যকে দিতে পারছি তা নয়। দুঃখটা এইটাই যে আমারটা দেখে আরেকজন কেউ শিখবে বা অনুকরণ করবে তা মনে হয় না। খুব কম লোকেই সেটা করেছে। সাধ্য আছে কিন্তু ইচ্ছে নেই। অনেকে হয়তো অনেক টাকা দিয়ে অনেক জিনিস কিনে ফেলল, এলোমেলো ভাবে ঘরে রেখে দিল, তা দিয়ে তো হবে না। আমি প্রতিটা জিনিস তিল তিল করে সংগ্রহ করেছি, কোথায় রাখবো, কীভাবে সাজাবো তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছি। অনেকে আমাকে অনেক জিনিস উপহার দিয়েছেন সেগুলোও আমি রেখেছি। তারজন্য খুব গর্বিত বোধ করি।

আচ্ছা আপনার কি মনে হয় আমাদের সৌন্দর্যবোধ-শিল্পচেতনা কীভাবে আরেকটু বাড়তে পারে? কীভাবে আমরা আরেকটু বেশি শিল্পমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারি?

আমার নিজের মনে হয় মানুষের জীবন কখনওই পরিপূর্ণ হয় না যদি না প্রাইমারি কালার সম্পর্কে তার কোনও জ্ঞান না থাকে। যদি না সে কোনও জিনিসের স্কেচ থেকে শুরু করে প্রতিটা জিনিস নিজের হাতে না করে থাকে। কীভাবে একটা রঙিন ছবি আঁকতে হয়, কী করে পেনসিল স্কেচ করতে হয়, শেড দিতে হয় নিজে নিজে তো শিখতে হবে এগুলো। কী করে প্রকৃতির চিত্র আঁকতে হয়, কেমন করে প্রতিকৃতি আঁকতে হয় – এগুলো তো সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ব্যাপার। আবার যাকে বলে ইমিটেশন, দেখে দেখে নকল করারও একটা স্তর আছে। কিন্তু সেই স্তরটা আবার পেরিয়েও যেতে হয়। তারপর নিজে নিজেই রূপগুলো নিয়ে ভাবতে হয়, তৈরি করতে হয়। এগুলো মানুষের প্রাথমিক জিজ্ঞাসা থেকেই তৈরি হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমনভাবে সিলেবাস তৈরি হয়েছে যে ড্রয়িং-এর পর আর কিছু শেখানো হয় না। আমার মনে হয় শিল্পকলা জিনিসটা খুব ব্যক্তিগত। সবাই ছবি আঁকতে পারবে একথা ঠিক নয়। এখনকার গার্জেনরা মনে করেন সবাই ক্রিকেট খেলতে শিখবে, সবাই গান গাইবে, ছবি আঁকবে। সেটা তো আর হয় না। এবং সেই সঙ্গে সবাই লিখবে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে এখন এত মানুষ লেখে, কিন্তু এত কম লেখক তাদের মধ্যে। লেখাটা পড়লেই বোঝা যায় যে লোকটা একটা লেখক। গান শুনলেই বোঝা যায় গলায় সা-টা ঠিক ধরা পড়েছে। সেরকম ছবির টান-টোন-স্ট্রোক দেখলেই বোঝা যায় এ একজন শিল্পী। এর তুলির টানই আলাদা, এ অনেক অনুশীলন করেছে। এইটাই শেষ কথা। অনুশীলনটা দীর্ঘদিন না করলে প্রকাশ ঠিকভাবে হয় না। অনবরত দেখতে হয়, অন্যের ছবি অবলোকন করতে হয়। দেখে দেখে বুঝতে হয় – 'ও, লোকটা এইরকমভাবে ভেবেছে!'

আপনি নিজে লেখার আগে কীভাবে বিষয়টাকে ভাবেন? তারপর কেমন করেই বা এগিয়ে নিয়ে যান নিজের ভাবনাটাকে? পুরো প্রক্রিয়াটা যদি একটু বলেন।

আমি যেহেতু নিজে লিখি, গান গাই এবং ছবি আঁকতে পারি, তিনটেই আমার ভেতরে আছে তাই তিনটের ওপর তুলনামূলক একটা কথা বলবো। যখন লিখি তখন অনেক আগে থেকেই সেটা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করি, করতে করতে একটা পয়েন্ট চলে আসে এবং লেখাটা শুরু হয়ে যায়। আবার এমনও হয়েছে আমি হয়তো একটা পাতা লিখে চলে গেলাম বাজারে, বাজার থেকে যখন এলাম তখন আমি প্রথম পাতার পুরো

ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। তখন আমি আমার প্রথম পাতাটা পড়ে নিয়ে দ্বিতীয় পাতার লেখা শুরু করি। আবার আমি একসঙ্গে দু-তিনটে লেখাও শুরু করতে পারি। তিনটে লেখারই প্রথমে একটা করে পাতা লিখলাম, তারপর দ্বিতীয় তৃতীয় পাতাটা লিখলাম, এরকম করে একসঙ্গে পুরো লেখাগুলোই শেষ হল। অনেকে হয়তো বলবেন এটা মেকানিক্যাল, কিন্তু এটা তা নয়। ভেতরে একটা নির্মাণ হয়েই থাকে। শুনেছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন 'কোনও উপন্যাসের একাদশ অধ্যায় প্রথমে লিখে তারপর প্রথম অধ্যায়টা লিখতে পারি আমি।' এককালে আমার এটা খুব অতুক্তি বলে মনে হয়েছিল, এখন আর হয়না। কারণ বিষয়গুলো এমন খোপে খোপে সাজানো থাকে যে ঠিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। লেখার ব্যাপারটা এই যদি হয় তাহলে গান গাওয়ার বিষয়টা হচ্ছে এইরকম যে – গানের তো একটা রূপ ভেতরে বাঁধাই আছে, তার কথা ও সুর তো আমার ভেতরে রয়েইছে। আমি শুধু সেই ব্যাপারটাকে টেনে বার করবো। টেনে বার করার ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম, ছোটোবেলায় আমি যে গানটা সুন্দর গেয়ে দিতাম পরবর্তীকালে সেটা আর ওইভাবে গাইনা, গানটাকে এখন বুঝে গাই। যত বয়স বাড়ে গানের ভেতরকার অর্থ, গানের ভেতরকার সুরসন্নিবেশ, তার স্ট্রাকচার সবটা বেশ বোঝা যায়। যিনি গীতিকার, সুরকার তার ইনটেনশান বেশ বোঝা যায়। ইনটেনশানটা বুঝতে না পারলে ভালো করে গান গাওয়া যায় না। আর ছবির বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। ছবির ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম – একটা সাদা কাগজ, তাকে আক্রমণ করতে হবে। একটা শূণ্যতাকে ধরতে হবে। শূন্যতার ভেতর থেকে আমার কাঙ্খিত রূপকে আমি ধরবো। আমার মনে হয় তিনরকম শিল্পের মধ্যে এই ছবি আঁকাটাই সবচেয়ে কঠিন। কারণ ছবির মধ্যে একটা রিজেকশন আছে। যে পরিমাণ ছবি এঁকে ফেলে দিতে হয় সেই ইতিহাসটা কেউ কোনওদিন জানতে পারে না।

এটা একটা দারুণ কথা আপনি বললেন, অনেক বাতিল খসড়ার ভেতর থেকে একটা সত্যিকারের ছবির জন্ম হয়।

ধরা যাক, একটা শূন্য সাদা কাগজকে আমি আক্রমণ করলাম তুলি দিয়ে। তার মধ্যে আস্তে আস্তে আমি আমার ভেতরকার রূপটাকে ফোটাতে পারলাম। এই পারার সময় একদিকে আমার চেনাজানা দৃশ্যের জগৎটা যেমন আমার স্মৃতির মধ্যে ধরা রয়েছে, তেমনি এমন অকল্পনীয় কিছু জিনিস তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যা আমি

কোনওদিন ভাবিনি। এই দুটো মিলে শিল্পকলা এগিয়ে যায়। পৃথিবীর যত বড়ো বড়ো শিল্পী আছেন আমি তাঁদের ছবি দেখি। সেই দেখার মধ্যে তার আলোছায়ার খেলা, তার রঙের বিন্যাস, ছবি সাজানোর ঠিকঠাক জায়গাগুলো আবিষ্কার করাই হচ্ছে শিল্পবোধের শেষ কথা।

আপনার প্রিয় চিত্রশিল্পী কারা? কাদের কাজ আপনার বেশি ভালো লাগে?

আমাদের দেশে যেসব বড়ো বড়ো শিল্পী জন্মেছেন তাদের মধ্যে থেকে আমাকে একজনের নাম করতে বললে আমি নাম বলতে পারবো না। বিদেশের শিল্পীদের মধ্যে করতে বললে সেটাও আমি পারবো না। তবু তার মধ্যে সেজানের আঁকা স্টিল-লাইফ আমার খুব ভালো লাগে। ভ্যান গঘের ছবি আমার আলাদা করে খুব ভালো লাগে। পিকাসোর ছবি আমার খুব বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তেমনি আমাদের ভারতবর্ষে নন্দলাল বসুকে আমি প্রশংসা করি। আমার মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের চেয়েও নন্দলাল অনেক বড়ো শিল্পী। আবার রবি বর্মার ছবির কথাও ভুলতে পারি না। তাঁর মধ্যে পৌরাণিক একটা ইম্প্রেশনিস্টিক ব্যাপার আছে, পুরাণকে তিনি যেভাবে দেখেছেন সেটা অনবদ্য। আবার একেবারে আমাদের চেনা অনেক ছেলেমেয়ে ছবি আঁকে, যেমন সহজে তারা আঁকতে পারে, তাদের রং-রেখার যে ব্যুৎপত্তি সেটা আমাকে চমকিত করে তোলে। আর রবীন্দ্রনাথের ছবিটা এত বেশি আত্মগত এবং তাঁর ছবিটা স্তরে স্তরে উন্মোচন করার মতো বিষয়। তবে, আমরা কিন্তু অনেক সময় ছবিকে সঠিক দূরত্ব থেকে দেখি না। আমি রবীন্দ্রনাথের কিছু ছবি স্লাইডে দূর থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাতে ছবিটাকে যেভাবে দেখতে পেয়েছিলাম ছাপা অ্যালবামে ঠিক ওই ডিসট্যান্সটা আসে না। আমার মনে হয় ছবিকে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে তার ভেতরের মর্যাদাটা বোঝা যায়।

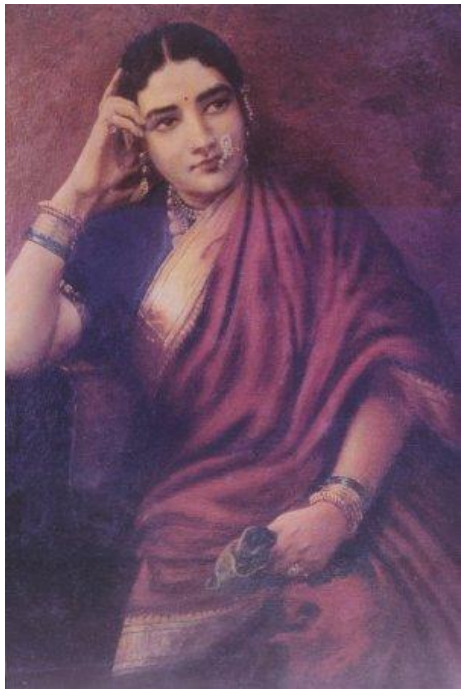

আমি এখনও পর্যন্ত ছবি দেখতে চাই, ছবির দিকে নজর রাখি।

আর আপনার বইয়ের প্রচ্ছদ-ভাবনা?

আমার যখন কোনও বই হয় তার প্রচ্ছদপটটা কীরকম হবে তাই নিয়ে আমার একটা ভাবনা থাকে। তার সঙ্গে লেটারিঙের যে ক্যালিগ্রাফি, সেটা নিয়েও আমার ভাবতে ইচ্ছে করে। সবসময় সেটা অবশ্য আমার হাতে থাকে না, শিল্পীর হাতেই থাকে। প্রকাশকরাও অনেকটা লিমিটেড। তাঁদের আর্থিক সামর্থ্য তেমন নয় যে তাঁরা যে কোনও অঙ্কের অর্থ দিয়ে ছবি আঁকাতে পারবেন। তবু চেষ্টা করি। যখন কোনও প্রচ্ছদের ছবি আমার কাছে আসে, আমার পছন্দ না হলে বলি আরেকবার আঁকা হোক। এই করতে করতেই আমার বইয়ের প্রচ্ছদপট তৈরি হয়। এ একটা আলাদা ইতিহাস।

সাক্ষাৎকারের তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০১৪, কৃষ্ণনগরে সুধীর চক্রবর্তীর নিজস্ব বাসভবনে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত।

চিত্র পরিচিতি : ১। সুধীর চক্রবর্তী; ২। দীপাবলি পুতুল; ৩। কৃষ্ণনগরের ঘুর্ণির পথ-ভাস্কর্য; ৪। 'ধ্রুবপদ' পত্রিকায় প্রকাশিত শিল্পী স্বপন বিশ্বাসের আঁকা বাউল; ৫। রামকিঙ্করের 'সুজাতা'। ৬। রাজা রবি বর্মা-র আঁকা ছবি।